IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলার নবজাগরণ ও রামমোহনের সমাজ ভাবনা

ঘনশ্যাম রায়
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ড. মেঘনাদ সাহা কলেজে
রানপুর, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুরল

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনও না কোনও সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই জাতির জীবনে নবজাগরণ এসছে। বাঙালী জাতির জীবনেও তেমনি নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে। পণ্ডিতদের মতে উনিশ শতকে বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাঙালি প্রথম প্রত্যক্ষ ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার সংস্পর্শে আসনে। এর ফলে সেই সময় থেকে সাহিত্য, শিল্প, সমাজ ও ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে বিপুল এক নবজাগরণ বা ভাববিপ্লব সংঘটিত হয়। বস্তুত, একদা কোলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করেই প্রথম এই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তীকালে ক্রমশ তা সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃতি লাভ করে। মোহিতলাল মজুমদার তাই এই উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসকে এ যুগের সারা ভারতের ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করছেন।

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই নবজাগরণের সলতে পাকানোর কাজটির প্রথম অনুপ্রেরণা এসছেলি পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাক্ষা□ ফল হিসেবে। আমরা জানি, মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারের অচলায়তনকি জীবন থেকে ইউরোপবাসীর চিন্তা ও মননশীলতার মুক্তির বিষয়টিই ছিল পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁসের মূল প্রাণশক্তি। অর্থা□ ব্যক্তির সার্বিক মুক্তি, অলৌকিক দৈবী শক্তিতে অহেতুক বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও মানবতা প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল পঞ্চদশ শতকের ইতালীয় রেনেসাঁসের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা পড়ছে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের পণ্ডিতরা ইতালিতে চলে আসার পর এই রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের উদ্ভব ঘটে। এর ফলে মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস, গীর্জাতন্ত্র ও কুসংস্কার থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতার মুক্তি ঘটে এবং সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যে এই নবজাগরণের প্রকাশ ঘটে। পঞ্চদশ শতকের আগে ইউরোপে নগর বিপ্লবের ফলে পশ্চিম ইউরোপের ইতালিতে প্রথম এই নবজাগরণের জীবন ক্ষেত্রে তৈরী হয় এবং পরবর্তীকালে গ্রীক পণ্ডিতদের আগমনের ফলে তা পত্র-পুষ্প-ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। এর ফলে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য-দর্শন-শিল্পের ব্যাপক চর্চা শুরু হয় এবং এই বিজ্ঞান-দর্শন চিন্তার প্রভাবে ইউরোপের মনোলোকে এক নতুন ভাবধারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের কুসংস্কার ও দৈবশক্তির ওপর অহেতুক বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সেই সময়ের ইউরোপের জনসাধারণ যুক্তি, বুদ্ধি, প্রমাণ ও বাস্তবতার ভিত্তিতে সব কিছুকে বিচার করতে প্রবৃত্ত হন। ধর্মনিরপেক্ষতা, ইন্দ্রিয়বাদ, যুক্তি ও মানবতাবাদের চর্চা সেই সময়ের ইউরোপীয় জনচিত্তকে মার্জিত করে তোলে এবং এরই সাথে সাথে তাঁদের মধ্যে অনুসন্ধানী মনোভাব গড়ে তোলে। এর ফলে বিজ্ঞান, গবেষণা ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এক দারুণ অগ্রগতি ঘটে এবং আধুনিক ইউরোপের জন্ম হয়।

বাংলার নবজাগরণও কোনও নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ থেকে শুরু হয় নি। সপ্তদশ শতক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করলে ইউরোপীয় জাতির সান্নিধ্যে আসার ফলে ভারতাত্মায় পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটে। সেই সময়ে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল; ভারতে সর্বত্র অরাজকতা দেখা দিয়েছিল এবং সেই সময়ের ঐক্যবদ্ধ মোগল সাম্রাজ্যও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই বিচ্ছিন্নতা ধর্ম, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মতো বিষয়গুলিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কোনও দেশের সংস্কৃতি যখন চলার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন সেই দেশের মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই নেমে আসে অজ্ঞতার অন্ধকার। আর এ রকম এক অন্ধ কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধিহীন আচারসর্বস্বতায় আবদ্ধ হয়ে সেই সময়ের ভারতীয় জীবন মোটের ওপর সংকীর্ণ, খণ্ড ও পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। আর দীর্ঘকাল এই তামসিকতার ছায়াতলে জীবনযাপন করার ফলে ভারতীয় মন থেকেও বুদ্ধি-বৃত্তি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। মোগল যুগের শেষের দিকে যখন ভারতীয় জীবন এক প্রকার রুদ্ধ এবং প্রায় অগ্রগতিহীন হয়ে পড়েছিল, ঠিক তখনই এদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতীয় জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ঠিক তখনই প্রাচীন জড় সংস্কারগ্রস্ত জীবনের প্রতি নানা জিজ্ঞাসা, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ শুরু হয়। ফলে এই সময় থেকেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের সংস্কৃতির তথা বাংলার সংস্কৃতির সম্পূর্ণ নতুন ভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা শুরু হয়। বলা বাহুল্য, এই ভাবপরিমণ্ডলকেই ইউরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গে তুলনা করে বাংলার নবজাগরণ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এই নবজাগরণের পরবর্তী সময়ে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি পাশ্চাত্য বিদ্যা চর্চার ফলে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত জড়ত্ব ও অন্ধত্ব ক্রমশ দূর হতে থাকে এবং শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবজাগরণের গতিবেগে এক অস্বাভাবিক আন্দোলনের ঢেউ তোলে। এর ফলে জাতি তার আপন সাংস্কৃতিক আদর্শ ও ঐতিহ্যগত চিন্তা-চেতনার সঙ্গে নতুন ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এই নতুন উপলব্ধ চেতনার আলোকে একটি আত্মবিস্মৃত জাতি যখন তার আত্মশক্তির পরিচয় পেয়ে আত্মমর্যাদা বোধে উদবুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একান্ত উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই আত্মমর্যাদা বোধই হ'ল নবযুগের বা নবজাগরণের প্রধান ভিত্তি।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মৌলিক অর্থ হ'ল পুনর্জন্ম লাভ। এর প্রচলিত অর্থ হ'ল জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবজাগরণ বা পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরেই বিশেষত ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই এটি প্রসার লাভ করেছিল। এর ফলে পুরোনো বিদ্যা ও ঐতিহ্যের ওপর নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা এবং পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন ও পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল।

বাংলাদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত ঠিক কখন থেকে শুরু হয়েছিল তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা অবশ্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছে বলে মত দিয়েছেন। আমরা দেখি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা এবং তার কিছুকাল পরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে শিক্ষিত বাঙালীর যে মানস পরিবর্তন ঘটে তারই প্রতিফলনে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে নবযুগের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রামমোহন, ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর প্রতিভা বাংলাদেশের সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেন। রামমোহন যখন কোলকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করছিলেন তখন ফরাসি বিপ্লবজাত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শে সমগ্র ইউরোপ উদ্‌বোধিত। স্বাভাবিক ভাবেই এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ রামমোহনের চিন্তাধারাকেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করেছে; বহু ভাষায় পণ্ডিত রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও গভীর সত্যানুসন্ধি□সার সমন্বয় ঘটেছে। তাই সতীদাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলার কোলকাতা কেন্দ্রীক এই যে নবজাগরণ তা কিন্তু সেই সময়ের কোলকাতা নগরীর বাইরে অর্থা□ গ্রামাঞ্চলে তেমন ভাবে সাড়া ফেলতে পারে নি; সে সুযোগও ছিল না। কারণ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষেরই মন পড়ে ছিল মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতায়। তবে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে এই নবজাগরণের গতিবেগে

ইউরোপীয় নবজাগরণের তুলনায় কোনও অংশে কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেও আমরা সেই কথার প্রতিফলন দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন---“আমার বিশ্বাস ইউরোপীয় সংস্কৃতি সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানাদিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগে লাগল তার জীবনে। পূর্বযুগের অজগর নিদ্রা থেকে তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল। বুদ্ধির সর্বজনীনতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্বমানবের পরিপ্রেক্ষণীতায় মানবত্বের উপলব্ধি বাংলাদেশেই রামমোহন রায়ের মতো মহামণীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মা□ আবির্ভূত হ’ল। আচারধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলাদেশেই প্রথম উদ্যত হয়ে উঠেছিল।’’

বাংলার নবজাগরণে আমরা দু’টি পৃথক ধারার সমন্বয় লক্ষ্য করি। একটি হ’ল পাশ্চাত্যের উদারপন্থী ভাবধারাত এবং অন্যটি হ’ল পুনরুজ্জীবনবাদী প্রাচ্য ভাবধারা। প্রথম ভাবধারার প্রভাবে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা, নানা সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নারীমুক্তি আন্দোলনের মতো ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল। আর, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি আন্দোলনগুলি হ’ল পাশ্চাত্যের উদারপন্থী ও যুক্তিবাদী ভাবধারার প্রভাবজাত ফল। এই যুক্তিবাদের পাশাপাশি এসেছে মানবতাবাদের চর্চা— অর্থা□ মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দানের প্রয়াস। অন্যদিকে, পুনরুজ্জীবনবাদীরাও ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি দারুণ ভাবে আস্থাশীল ছিলেন। ইউরোপের সব কিছুই শ্রেষ্ঠ আর ভারতের সব কিছুই নিকৃষ্ট---এ কথাকে তাঁরা তেমন ভাবে মান্যতা দেলিনে না। তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি এতটাই মোহগ্রস্ত ছিলেন যে, তাঁরা ভারতীয় সভ্যতা বলতে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাকেই মানতেন। তাই শেষে পর্যন্ত বাংলার নবজাগরণে এই সমন্বয়বাদী আদর্শই স্থান পায়। প্রাচীন যুগের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সঙ্গে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলা তথা সারা ভারতের অগ্রগতির পথনির্দেশে ছিল সমন্বয়বাদী ভাবধারার মূল বৈশিষ্ট্য। আর এই সমন্বয়বাদের মূল প্রবক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহনের জন্মের সময়ে এদেশে মধ্যযুগের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষ তখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে এক প্রকার নিমজ্জিত; কু-আচার, কুসংস্কার, জড়তা ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ভারতবাসীর জীবনের গভীরে প্রোথিত; অতিরিক্ত আমোদ ও আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানই ছিল সেই সময়ের মানুষের ধর্মচর্চার মূল ভিত্তি। আবার অন্যদিকে, গরিবের প্রতি ধনীর অত্যাচার কিংবা নারী জাতির প্রতি প্রতিবাদহীন অজস্র নির্যাতন ও বঞ্চনাকে সেই সময়ে বিধাতার নির্দেশিত বিধানের মতো মান্য করা হ’ত। তাই সমাজে নির্বিবাদে প্রচলিত ছিল বহু বিবাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দিয়ে পূণ্য সঞ্চয় করার প্রথা, সতীদাহ, অন্তর্জলী যাত্রার মতো কিছু অমানবিক বিধান। রামমোহন ছিলেন পৌত্তলিকতার বিরোধী এবং বিরোধী ছিলেন বহুদেবত্বেরেও। ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর পছন্দ হ’ত না; ধর্মকে তিনি যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিতে দেখতে আগ্রহী ছিলেন। তাই হিন্দু ধর্মের নামে এই সব আচারগত ধর্ম এবং হিন্দুদের বহু দেবদেবীর উপাসনা করার প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি সমাজের বুকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। রামমোহনের এই একেশ্বরবাদী ধারণার নেপথ্যে সেই সময়ের গির্জা ও মসজিদের উপাসনা পদ্ধতির সম্মীলিত প্রভাব লক্ষ করা যায়। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ধর্মের একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে তিনি বিশ্বমানবমৈত্রীর উপযুক্ত এক ধর্মের কথা ভেবেছেন।

আবার অন্যদিকে, রামমোহনের সমকালীন সমাজ ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শুদ্র—এই চার সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আর সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটি বিরাট জনগোষ্ঠী ছিল গ্রামবাসী। তাই অশিক্ষা, দারিদ্রতা ছিল তাদের জীবনের নিত্য সহচর। রামমোহন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সমতা রক্ষা করে তাদের মধ্যে সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে তিনি তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘ব্রাহ্ম সভা’র আদর্শের মধ্যেই এর প্রমাণ নিহিত আছে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা সম্প্রদায়কে ইউরোপীয় জাতীয়তার আদলে একটি মাত্র Nation বা জাতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং সম্ভব হলেও তা করা সমীচীন নয়। কারণ এতে এই সব ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুলি যদি নষ্ট হয় তাহলে শুধু যে তাদেরেই ক্ষতি হবে তা নয়, এতে Universal Humanity বা বিশ্বমানবতারও সমূহ ক্ষতি হবে। কারণ

রামমোহন মনে করেন, এই বিশ্বমানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পতি ব্রহ্মের মতোই বিভিন্ন আধারের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে এবং বৈচিত্রের মধ্যেই তার সত্যিকারের শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশিত। জীবের সমস্ত অঙ্গ নষ্ট হয়ে যদি একটি মাত্র অঙ্গে পরিণত হয় তাহলে সে যেমন পঙ্গু হয়ে পড়ে, সেই রকমই জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি যদি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় তাহলেও বিশ্বমানব পঙ্গু হয়ে পড়বে। তাই রামমোহন ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও তার ধর্মীয় সাধনাকে ভেঙে-চুরে এক ছাঁচে ঢেলে তাকে একেবারে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। তাই হিন্দুকে তিনি হিন্দু রেখেই বড়ো করতে চেয়েছেন এবং অন্যদিকে মুসলিমকেও তিনি মুসলিম রেখেই বিশ্বমানবের অভিমুখী করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর জাগতিক এবং কোরানও জগতের মতোই পরিবর্তনসাপেক্ষ। সমাজ ও ধর্ম নিয়ে এমনই একটি উদার ক্ষেত্র তৈরি তাই তিনি সমাজ জীবনে ধর্মীয় কুসংস্কারের মূল উ□পাটন করতে অগ্রসর হন। কারন তিনি মনে করতেন সত্য ও কল্যাণ তা সে যেকোনও আকারেই প্রকাশিত হোক না কেন, মূলত তা এক। সত্য ও কল্যাণের মধ্যে প্রকৃত অর্থেই কোনও ভেদ কিংবা বিরোধ নেই। তিনি ভারতবর্ষকে আপনার বৈচিত্র্যে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বের মতো করে দেখেছেন। এখানে বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, বিভিন্ন সাধনা এবং সভ্যতা এসে মিলেছে। এই ভারতে যদি একটি মাত্র মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে তার এই প্রকৃতিগত ধর্মানুরাগকে কখনই নষ্ট করলে চলবে না। শুধু ধর্ম যেখানে সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে তার নিজের প্রাণশক্তি হারিয়েছে—সেখানে তিনি তাকে সংস্কারমুক্ত করে সজীব করতে চেয়েছেন মাত্র। অন্যদিকে, রামমোহন 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে বিশিষ্ট কোনও সমাজও গড়ে তুলতে চান নি। তিনি তাঁর সমসাময়িক হিন্দু সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে ও সংকীর্ণতাকে দূর করতে চেয়েছেন হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র এবং মহাজনদের প্রদর্শিত পথের সহায়তায়। কারণ চিন্তা ও চেতনায় তিনি আগাগোড়াই ছিলেন সমন্বয়বাদী মনোভাবের পথিকৃ□।

রামমোহন ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও বেদান্ত কলেজ। এ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি একই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দু'ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও তাঁর মনে অদম্য আগ্রহ বর্তমান ছিল। কারণ সে যুগে নারীর জীবন ছিল অসহায়, কুসংস্কারে নিমজ্জিত এবং অমর্যাদায় মলিন। সে যুগে সমাজের বুকে দুরারোগ্য ও নিষ্ঠুর ব্যাধির মতো সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ, বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য অমানবিক প্রথার ভিত্তি অপসারণ করে তিনি ব্রিটিশ শাসনকালে এক অনন্য নজির তৈরি করতে সমর্থ হন। অচলায়তন সমাজের বুক থেকে এই নিষ্ঠুর প্রথাকে চিরতরে দূর করতে রামমোহন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মনে করেছেন সতীদাহের মতো অমানবিক প্রথা সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন মানুষ ছাড়া যে-কোনও সুস্থ মানুষের মনকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাই প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে সমাজে ব্যাধি স্বরূপ এই বর্বর প্রথাগুলিকে দূর করতে রামমোহন সমাজের অজ্ঞ, ধর্মান্ধ, নির্মম হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বলা বাহুল্য, যুক্তির সাহায্যে জীবনের পরম সত্যের সন্ধান করাই ছিল রামমোহনের সমাজ সংস্কার-ভাবনার মূল আদর্শ। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বেদান্তাদি-শাস্ত্র, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। প্রাচীন আর্যরা যেমন ভাবে শাস্ত্র ও সমাজের মূল ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই সেগুলিকে সময়ের উপযোগী ব্যাখ্যার সাহায্যে পরিবর্তিত, সংশোধিত ও সংবর্ধিত করতে ছেয়েছেন--রাজা রামমোহন রায়ও তাঁদেরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আধুনিক ভারতের সমাজের জন্য সেই কাজটি করে গেছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১) মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা.) : *‘পশ্চিমবঙ্গ’* (রামমোহন সংখ্যা), ১৪০৩, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা- ১

২) দাস, ইন্দুভূষণ : *রামমোহন বিদ্যাসাগর মাইকেল*, সাহিত্যলোক, কলকাতা- ১২

৩) সেন, ড. সুকুমার : *বাংলা সাহিত্যে গদ্য,* প্রথম আনন্দ সংস্করণ- ১৯৯৮, কোল- ৯

৪) সেন, ড. সুকুমার : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (৩য় খণ্ড), প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৪০১, কোল- ৯

৫) জানা, ড. শ্রীমন্ত কুমার : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (আঃ যুগ, ১ম পর্ব), ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রা. লি., কোল- ৯